দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# বই ও সম্প্রীতিময় সমাজ

গত শুক্রবার শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে ত্রয়োদশ ঢাকা বইমেলা ২০০৬ উদ্বোধন করা হইয়াছে। এই মেলা ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পর্যন্ত চলিবে। সাধারণত প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসে ঢাকায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু জানা যায়, মেলার আয়োজক জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ঈদুল আজহার কারণে মেলার সময় এক মাস আগাইয়া আনিয়াছে। এই মেলা এমন সময় আয়োজন করা হইয়াছে যখন দেশ সঙ্কটময় সময় অতিক্রম করিতেছে। তাই এবারের ঢাকা বইমেলার প্রতিপাদ্য বিষয় হল-'সম্প্রীতিময় সমাজ গঠনে বই।' সংগত কারণে ইহা সময়োপযোগী হইয়াছে বলিয়া দাবি করা যাইতে পারে।

গত বৎসর যখন অমর একুশে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, তখন হরতাল অবরোধ পড়িয়াছিল। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, বইমেলায় এ সবের তেমন একটা প্রভাব পড়ে না। বলা যায়, ছন্দপতন ঘটায় না। তাই এবারের ঢাকা বই মেলায় প্রকাশকরা আশাবাদ ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, হরতাল-অবরোধ থাকিলেও বইমেলা থামিয়া থাকিবে না। ইহা বইপ্রেমী পাঠকদের কিছুটা হইলেও আশ্বস্ত করিবে। কারণ বই মেলার সহিত অন্য কোন মেলার তুলনা হইতে পারে না। এই মেলায় যাহারা আসিয়া থাকেন, স্বভাবতই তাহারা ভিন্ন মেজাজের মানুষ। সৃজনশীলতা ও মননশীলতাকেই তাহারা প্রাধান্য দিয়া থাকেন।

জানা যায়, এবারের ঢাকা বইমেলায় অংশ নিয়াছে ৬৭টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। তন্মধ্যে রহিয়াছে ৫টি বিদেশী ষ্টলও। আগের নিয়মানুযায়ীই ৩০ ভাগ মূল্য ছাড় দেওয়া হইতেছে। ১৯৯৫ সাল হইতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হইলেও ইহার জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান গড়িয়া উঠে নাই। উল্লেখ্য, আমাদের দেশে ১৯৯৪ সালে খ্রিষ্টীয় নববর্ষ তথা ১ জানুয়ারিকে জাতীয় গ্রন্থ দিবস এবং ১ থেকে ৭ জানুয়ারিকে গ্রন্থ সপ্তাহ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তাহারাই সূত্র ধরিয়া ঢাকা বইমেলার সূত্রপাত। গ্রন্থ সপ্তাহের দিনগুলিতেও একই কারণে দেশের ৬৪টি জেলায় সপ্তাহব্যাপী বইমেলার আয়োজন করা হইয়া থাকে। ইহার পর সারা বৎসর বইয়ের আন্দোলনকে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে ২০০২ সালকে গ্রন্থবর্ষ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এসব আয়োজন নিঃসন্দেহে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে সহায়ক।

এবারের ঢাকা বইমেলার প্রতিপাদ্য বিষয়টি আমাদের নজর কাড়িয়াছে। কারণ সমাজে সহনশীল ও সম্প্রীতিমূলক মনোভাবের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। যাহার যাহার অবস্থান হইতে সকলে সহনশীল হইলে দেশের অনেক সঙ্কট দূর হইয়া যাইবার কথা। বই-ই সহনশীল সমাজ গঠনে প্রধান ভূমিকা রাখিতে পারে। বই মানুষকে আলোকিত করে। ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনও বটে। নিত্য-নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারের ফলে মানুষ বই বিমুখ হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, সেই প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে দীর্ঘমেয়াদে ধারণ করিবার জন্য বইয়ের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বই ও প্রযুক্তির মধ্যে কোন বিরোধ নাই। আসলে বইপড়া কিংবা বই কেনা সম্পূর্ণ অভ্যাসের ব্যাপার।

তবে একটি বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার হওয়া উচিত যে সাহিত্যগ্রন্থই শেষ কথা নয়। সাহিত্য মানুষের হৃদয়বৃত্তির জন্য সহায়ক। কিন্তু মানব জীবনের সার্বিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য দরকার কাজের বই। ইহাতে সাধারণত মানুষের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ থাকা বাঞ্ছনীয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের পূর্বে ঘটিয়া যায় রেনেসাঁ বা জাতীয় পুনর্জাগরণ। জ্ঞানী-গুণী-পন্ডিত-মনীষী-চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও কবি সাহিত্যিকরা ছিলেন সেই রেনেসাঁর অগ্রপথিক। তাহলে কি বলা যায় না সব কিছুর মূলে বই ছিল এবং তাহা বিচিত্র ধরনের? পাড়ায় পাড়ায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে নতুন নতুন পাঠাগার অবশ্যই গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবে তাহা যেন সব ধরনের বয়স ও শ্রেণীর মানুষের রুচি ও জানার আগ্রহকে পরিপূর্ণ করে। এ কারণে পাঠাগারে মানুষের দৈনন্দিন কাজে লাগে এমন বইয়ের সমাহার আরো বাড়াইতে হইবে। মানুষকে বইমুখী করিবার জন্য ইহাও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে।

বই মানুষকে সহনশীল এবং একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইতে শিক্ষা দেয়। ইহা সবার মধ্যে এক ধরনের ঐক্যবদ্ধ মনোভাবেরও সৃষ্টি করিয়া থাকে। কিন্তু সকল কিছুর মাঝে বইকে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারি না বলিয়া সম্প্রীতিময় সমাজ গঠন এখনো কল্পনায় থাকিয়া গিয়াছে। অথচ সম্প্রীতি ও সহনশীলতা যাহাই বলি না কেন উহা সমাজের ভিত্তিমূল। এই ভিত্তিমূলকে আরো মজবুত করিতে হইলে আমাদের সৃজনশীল ও মননশীল বই প্রকাশ, বিপণন, বইয়ের চাহিদা বৃদ্ধি, পাঠাভ্যাস বাড়ানো প্রভৃতির প্রতি গুরুত্বারোপ করিতে হইবে। শহর, গ্রাম-মহল্লায় শুধু পাঠাগারের সংখ্যা বাড়াইলেই চলিবে না, ইহার পাঠক সংখ্যাও বৃদ্ধি করিতে হইবে।